ট্রুডবার্টা ও অলোকরঞ্জনের জন্য

এই লেখকের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

নীল নির্জন
অন্ধকার বারান্দা
প্রথম নায়ক
নীরক্ত করবী
নক্ষত্র জয়ের জন্য
কলকাতার যিশু
উলঙ্গ রাজা
খোলা মুঠি
কবিতার বদলে কবিতা
আজ সকালে
পাগলা ঘণ্টি
ঘর-দুয়ার
রূপ-কাহিনী
সময় বড় কম
যাবতীয় ভালবাসাবাসি
শ্রেষ্ঠ কবিতা
কবিতাসমগ্র-১
কবিতাসমগ্র-২

ছোটদের জন্য

সাদা বাঘ
বিবির ছড়া

সূচীপত্র

ঘুমিয়ে পড়ার আগে
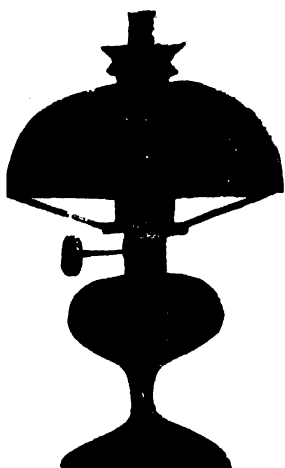
পথ যার প্রেমিক

উত্তর-শহরতলিতে আমার এই বাড়ির মধ্যে আমি
বসে রয়েছি।
অথচ আমার শরীরের ভিতর থেকে
বেরিয়ে এসেছে শরীর। আমি
দেখতে পাচ্ছি,
দিঘার ফোরশোর রোডের পশ্চিম দিকের সীমানা ছাড়িয়ে
বালির উপরে উপুড় করে রাখা
জেলেডিঙির পাশ দিয়ে
মুখের উপরে লোনা হাওয়ার ঝাপট লাগিয়ে সে ওই
চন্দনেশ্বর মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মাঝে-মাঝেই আমার ভাবনাচিন্তায় যেন
তালগোল পাকিয়ে যায়। আর
তখনই আমার
চোখের সামনে নিমেষে পালটে যায়
দৃশ্যপট।
আমি দেখতে পাই সেই মানুষটিকে,
থলকোবাদের পাহাড়চূড়ার বাংলোর বারান্দায় যে এখন
চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে
স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। কিংবা
মধ্যভারতের হৃৎপ্রদেশের ভিতর দিয়ে যেতে-যেতে
ট্রেনের জানলায় মুখ রেখে দেখছে
সূর্যাস্ত।

আমি আমার শহরতলির বাড়িতে বসে তাকে দেখছি।
অজয়ের মাটির বাঁধের উপর দিয়ে
কালকেই সে দুবরাজপুরের দিকে চলে গিয়েছিল। আর আজ
ঘুমের বৌদ্ধ মন্দিরের
গম্ভীর অথচ স্বপ্নময় ঘণ্টাধ্বনি শুনতে-শুনতে
কুয়াশার ভিতর দিয়ে
ধীর পায়ে সে নেমে আসছে
সোনাডার দিকে।

আমি আমার ঘরের মধ্যেই বসে আছি । অথচ আমার
শরীরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে
শরীর । আমার
ঘরের দেওয়াল ধসে পড়ছে, আর আমার
চোখের সামনে পালটে যাচ্ছে
দৃশ্যপট ।
আমি দেখতে পাচ্ছি,
পাহাড় আর প্রান্তরের ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছে
ঢেউ-খেলানো পথ । আর
দেখতে পাচ্ছি সেই মানুষটিকে,
আজন্ম যে ওই পথকেই তার প্রেমিক বলে জেনেছে ।

পাহাড় থেকে সে নেমে এসেছে ।
অনেক অরণ্য আর প্রান্তর সে পেরিয়ে এসেছে ।
তার চোখের মধ্যে লেগে রয়েছে অল্প-একটু
কৌতুক, আর তার
চুলের মধ্যে এখন আবার খেলা করছে
ভোরবেলাকার সমুদ্রের হাওয়া

এই-বৃষ্টি নেই-বৃষ্টি

বর্ষা তো সেই কবেই কেটে গেছে। কিন্তু
যতই না কেন যাই-যাই করুক,
বৃষ্টি এখনও
পুরোপুরি এই তল্লাট থেকে
যায়নি।

সাবান দিয়ে আচ্ছা করে কেচে তারপর
নীলের গামলায় জব্বর করে
চুবিয়ে নিয়ে
আকাশ জুড়ে টান করে কেউ
পেতে রেখেছিল
সূর্যদেবের গায়ের সাদা চাদর।

কিন্তু এই একটু আগেই তার উপরে পড়ল
মেঘের ময়লা বাচ্চাগুলোর
ধুলোবালি-মাখা
নোংরা পায়ের ছাপ।

বাস্, আকাশ জুড়ে অমনি ঘনিয়ে উঠল
অন্ধকার। আর
চড়বড় করে তক্ষুনি এমন বৃষ্টি নামল যে,
জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি,
রাস্তা একদম ফাঁকা।

শরৎকালের অর্ধেকটাই কাবার, অথচ
এখনও এই
মজার খেলা চলছে। আর
এই-বৃষ্টি নেই-বৃষ্টির খেলা দেখতে-দেখতেই
আমরা সবাই
ক্যালেণ্ডারের পাতা উলটে দেখে নিচ্ছি
লাল-বর্ডার-দেওয়া তারিখগুলোকে।

ওই যে বললুম, বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকে না।

হঠাৎ যেমন ঝাঁপিয়ে আসে
ঠিক তেমনি
দেখতে না দেখতে
হঠাৎ আবার চলেও যায় ।

পানের দোকানের তেরপলের ছাউনি, গাছতলা আর
গাড়িবারান্দার আশ্রয় থেকে অমনি
পিলপিল করে
বেরিয়ে আসে মানুষ ।
আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা দেখতে পায় যে,
রোদ্দুরের চাদর থেকে
ময়লা-কালো সেই ছাপগুলো ফের
মিলিয়ে গেছে ।

জ্যোৎস্নারাতে

আমি বললুম, সুন্দর !
এই আশ্বিন মাসে
রহস্য তার লেগেছে অপার
বিমুক্ত নীলাকাশে ।

আমি বললুম, এসো !
সে তবু আসে না কাছে ।
মায়া দিয়ে গড়া
জ্যোৎস্না অধরা
দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে ।

আমি ভাবি, এ কি বিভ্রম ?
দাঁতে ঠোঁট চেপে হেসে
তখুনি সে ঘরে
ধুলোর উপরে
ঝাঁপিয়ে পড়ল এসে ।

ভিতরে-ভিতরে

বাইরে থেকে কিছু ধরা যায় না, কিন্তু
ভিতরে-ভিতরে এখন
অষ্টপ্রহরই চলছে বিরাট-বিরাট সব
ভাঙচুরের কাজ ।

রোজই ধসে পড়ছে এমন সব মূর্তি, প্রত্নশালা ও
স্মৃতিস্তম্ভ,
গত একশো বছরের মধ্যে যাদের
শরীরে কোনো ফাটল ধরেনি ।

ধরিয়ে দেবার দরকার হয়েছিল । তাই
ভিতরে-ভিতরে
রোজই এখন মস্ত-মস্ত সব
ভাঙচুর চলেছে ।

অনেক কিছু দেখব বলেই
অনেক অনেক দীর্ঘ একটা জীবন আমরা
চেয়েছিলুম।
অনেক শহর, অনেক নদী, অনেক অরণ্য, অনেক
পাহাড়, অনেক সমুদ্র।

আমরা দেখতে চেয়েছিলুম, অনেক রকম কাজের মধ্যে
মগ্ন হয়ে রয়েছে অনেক জনপদ।
নদীর উপরে অনেক রকমের পণ্য আর যাত্রী নিয়ে
ভেসে যাচ্ছে নৌকো। আর
বাতাস গিলে
ফুলে উঠেছে তাদের অনেক রঙের বাদাম।

অনেক পাহাড় আর অনেক সমুদ্র পেরিয়ে
অনেক গ্রামে আর গঞ্জে আমরা
পৌঁছতে চেয়েছিলুম। আর
দেখতে চেয়েছিলুম
কোন্ দিগ্বলয়ের আড়াল থেকে সূর্য কীভাবে
লাফিয়ে ওঠে, আর
কোন্ সমুদ্রের মুখাগ্নি করে কোন্‌খানে সে
হারিয়ে যায়।

দেখতে চেয়েছিলুম, দিনের আকাশে মেঘের জাল ছিঁড়ে এই
পৃথিবীর দিকে
হিরণ্য-মুকুট-পরিহিত অশ্বারোহী সৈন্যদলের মতো
নেমে আসছে রোদ্দুর, আর
রাতের আকাশে
হিরের কুচির মতো জ্বলজ্বল করছে নক্ষত্র।

বৈঠকখানা রোডের জীর্ণ একটা মেসবাড়ির
অন্ধকার একটা ঘরে বসে
একদিন এই সমস্ত কিছুই আমরা দেখতে চেয়েছিলুম, বীরেন। আর
দেখতে চেয়েছিলুম যে, এই

দৃশ্যাবলীর মর্মমূলে দাঁড়িয়ে রয়েছে
কালো পাথর কুঁদে তৈরি করা সেই অক্ষয় মানুষ,
যে থাকলে তবেই এই দৃশ্যগুলি
সার্থক হয়ে ওঠে ।

জীবনবালা

পলাশি ছাড়িয়ে আমাদের ট্রেন তখন
বেলডাঙার দিকে এগোচ্ছিল।
সেই সময়ে
ঝালমুড়ির শূন্য ঠোঙাটাকে
দলা পাকিয়ে জানলার বাইরে ফেলতে গিয়ে আমার
দৃষ্টি হঠাৎ
বাইরের পৃথিবীতে আটকে যায়।

আমি দেখতে পাই যে,
আবছা গুটিকয় ঘরবাড়ি ও গাছপালাকে
বুকের মধ্যে সাপটে নিয়ে সেই পৃথিবী
জ্যোৎস্নার এক বিপুল প্লাবনে
ভেসে যাচ্ছে।

এখন তো সকালবেলা, আর এখন তো
সূর্য উঠেছে, আর
সূর্যের আলো তো আমাদের ভুলগুলিকে খুব
নিপুণ হাতে ধরিয়ে দেয়,
তাই এখন আমি বুঝতে পারছি যে, আমার
রাত্তিরের ভাবনায় অনেক
ভুল ছিল।

কিন্তু কাল রাত্তিরে
ট্রেনের জানলা থেকে বাইরে চোখ রেখে
কী ভেবেছিলুম আমি?

আমি ভেবেছিলুম যে,
জ্যোৎস্না এই পৃথিবীকে আজই প্রথম এইভাবে
ভাসিয়ে নিচ্ছে। শুক্লপক্ষে
এর আগে আর কখনও এমন
ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডাকেনি।

আমি আরও ভেবেছিলুম যে, যা আমি এতদিন ধরে

খুঁজে বেড়াচ্ছি,
চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে ওই
মাঠের মধ্যে নেমে
মাইলখানেক হাঁটলেই সেই আমার জীবনবালাকে আমি
পেয়ে যাব।

একটা মিলের জন্য

সেইসব দিনের কথা আজকাল
মাঝে-মাঝেই আমার
মনে পড়ে যায়, যখন
আকাশ-ভরা আলো ছিল, আর
বাগান-ভরা ফুল।
তখন মৃত্যু বলতে আমার জীবনে কিছুই
ছিল না।

দিনকাল কত তাড়াতাড়ি পালটে যায়।
এখন
আকাশের আলো নিবে যাচ্ছে, আর
বাগান-ভর্তি আগাছা।
এখন
প্রতিটি দেওয়াল থেকে আমার দিকে
স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে
আমারই মৃত পরিজন ও বন্ধুদের
মুখচ্ছবি।

এখনও আমি নিত্য আমার
লেখার টেবিলে এসে বসি।
কিন্তু
এই টেবিল থেকে যখনই মুখ তুলে আমি
তাঁদের দিকে তাকাই,
তখনই, কী জানি কেন, আমার মনে হয় যে,
গলদ্‌ঘর্ম আমার এই কাণ্ডকারখানা দেখে
তাঁরা দারুণ মজা পাচ্ছেন।

আমার মনে হয়,
মুখ টিপে তাঁরা হাসছেন। যেন
বলতে চাইছেন, 'আর কেন,
অনেক তো হল,
দেরাজের মধ্যে খাতা আর কলম ঢুকিয়ে এখন
চলে এসো।'

আমি বলি, ‘যেতেই তো চাই। কিন্তু একটা
মুশকিল হয়েছে।
সেই যে একটা মিল খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম,
এখনও সেটা পাওয়া যায়নি। পেলেই চলে যাব।’

ঈশ্বরের মুখোমুখি

পাহাড়টাকে
মস্ত একটা ময়াল সাপের মতন
আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে যে
সরকারি সড়ক,
তার ল্যাজা থেকে
পাক খেতে-খেতে, পাক খেতে-খেতে
পাক খেতে-খেতে
হঠাৎ একসময়
মুড়োয় উঠেই আমি অবাক ।

অবাক কেন, এই তো ?
তা হলে শুনুন,
আমি মোটেই বুঝতে পারিনি যে,
ঈশ্বর সেখানে
আমারই জন্যে অপেক্ষা করছেন ।

সে ভারী সুন্দর জায়গা ।
আমি যখন পৌঁছই,
এক ঝাঁক সাদা পায়রা তখন তাঁর
লাল-টালির-ছাউনি-দেওয়া বাড়ির
বারান্দা থেকে
গমের দানা খুঁটে খাচ্ছিল ।

একগাল হেসে
ঈশ্বর আমার সামনে এসে
দাঁড়ালেন !
তারপর তাঁর বাঁ হাতের তর্জনী তুলে
নীচের মাঠটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন,
'আরও গম ফলাও, যাতে আমি আরও অনেক
পায়রা পুষতে পারি ।'

হুকুম তো পেয়েই গেলুম ।
সরকারি সড়কের মুড়ো থেকে

পাক খেতে-খেতে, পাক খেতে-খেতে,
পাক খেতে-খেতে
আবার সেই তার ল্যাজার দিকেই আমি এখন
নেমে আসছি ।

হির্শবার্গ-১

পাহাড় বলে না কথা, অরণ্য স্তব্ধতা ভালবাসে ।
পথে দুটি-চারটি নরনারী ।
তারাও নৈঃশব্দ্যে ভেসে যেতে-যেতে ইঙ্গিতে ফোটায়
প্রণয়ের ভাষা ।
ট্রুডবার্টা, অলোক, আমি যদিও রয়েছি পরবাসে,
তবু আমি বুঝে নিতে পারি
কীভাবে এখানে এই স্তব্ধতার মধ্যে বেদনায়
ফুটে ওঠে সহজ সৃষ্টির ভালবাসা ।

হিমবার্গ-২

চেয়েছিলে মুক্তি, তুমি চেয়েছিলে বাঁধানো রাস্তায়
চলবার স্বাচ্ছন্দ্য, তাই খুঁটি
বসিয়ে এবং তুলে পরবাস থেকে পরবাসে
ক্রমাগত ভেসে চলে যাওয়া।

অথচ যা চেয়েছিলে, দেবতার মুঠি
তা-ই রেখে দিয়েছিল বুড়ি-ঠাকুমার বারান্দায়।
ছিল না স্বাচ্ছন্দ্য ? ছিল। কাঁকুরে পথে ও কাঁটা-ঘাসে
তাও যেত পাওয়া।

অথচ পেয়েও তুমি নিলে না, এখন তাই পড়ন্ত বেলায়
ফুটেছে আকাশে ক্ষুব্ধ মেঘের ভ্রূকুটি,
উত্তর-সমুদ্র থেকে ছুটেছে হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়া।

রবিবারের সকালবেলায়

রোজ হয় না, শুধু রবিবারের সকালবেলায়
বাড়ির সামনের গলি থেকে
বড় রাস্তা পর্যন্ত আমি
হেঁটে যাই, আর তার মিনিট তিরিশেক বাদেই আবার
ফিরে আসি।
কিন্তু এই যাওয়া-আসার, ভালবাসার
পালা যে এবারে ফুরিয়ে এল,
এই কথাটা মনে পড়বামাত্র আমার
বুকের রক্ত সেদিন হঠাৎ ছল্‌কে ওঠে।

আমি দেখতে থাকি যে, রাস্তার ধারের
কৃষ্ণচূড়া তার মাথায় জড়িয়েছে
লাল ওড়না, আর
জারুল পরেছে বেগ্‌নে রঙের শাড়ি।
হুহু করে বাতাস ছুটে আসে, আর তাদের
ডালপালা থেকে
শূন্যে পাক খেতে-খেতে উড়ে যায়
হলুদ রঙের পাতা।

হাঁটতে-হাঁটতে আমি দাঁড়িয়ে পড়ি।
ঝাপসা হয়ে যায় আমার চোখ।
চারপাশে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারি যে,
পুরনো পাতা ঝরিয়ে দিয়ে
পৃথিবীর এখন আবার নতুন করে সাজ ফেরাবার
সময় এসেছে।

কৃষ্ণচূড়ার যে ডালটা একেবারে পথের উপরে এসে
ঝুঁকে পড়েছে,
তার পত্রপল্লবে হাত বুলিয়ে আমি বলি,
আমারও এবারে সাজ ফেরাবার সময় হয়ে এল, তাই
বিদায় নিয়ে রাখি।
আর হয়তো তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

ফাল্গুনের দুঃসহ নীল আকাশ অমনি
দুলে ওঠে, আর
পথের ধারের সমস্ত গাছপালা
সমস্বরে বলতে থাকে : বিদায়, বিদায়, বিদায় !

দিল্লি কিংবা বোম্বাই কিংবা
শিলচরের ফ্লাইট ধরবার জন্যে সেই
সাত-সকালে যারা
দমদম এয়ারপোর্টের দিকে ছুটছিল,
চলন্ত গাড়ির জানলা থেকে হাত বাড়িয়ে
তারাও তখন
রুমাল নাড়তে থাকে । কেননা,
তারাও জানে যে, আর কখনও তাদের সঙ্গে আমার
দেখা হবে না ।

জোয়ারের পর

মাঝে-মাঝে লোকজন আসে।
তখন
দু'চার দিনের জন্যে
গমগম করে ওঠে এই বাড়ি।
তারপর
হঠাৎ আবার ঝিমিয়ে যায় সবকিছু।
এই ঘর, এই
বারান্দা আর এই বাগান।

আমরা ভাবি,
কাউকে আমরা যেতে দেব না।
কিন্তু যারা আসে,
নেহাতই দু'চার দিনের জন্যে আসে তারা

সবকিছু ভাসিয়ে তারপর
জোয়ারের জল একদিন
সরে যায়।
জলের তলা থেকে বেরিয়ে পড়ে
বালি আর পাথর।
বুকের মধ্যে খাঁখাঁ করতে থাকে।

কালবৈশাখী

কয়েকটা দিন খুব উল্টোপাল্টা বাতাস দিয়েছিল । কিন্তু
শহর এখন স্থির ।
ঘড়ির কাঁটা যেমন সব সময়েই এগিয়ে চলে না,
এক-আধবার থেমেও যায়,
ছুটতে-ছুটতে বাতাসও তেমনি দাঁড়িয়ে পড়ে ।
কলকাতা শহরে
হেঁটোয়-কাঁটা যে-ক'টা গাছ এখনও
পাঁজরে বুলডোজারের লাথি খেয়ে
ফুটপাথের উপরে
মুখ থুবড়ে পড়ে যায়নি,
তখন তাদেরও বুক-দুরদুর করতে থাকে, আর
চোখের পলক পড়ে না ।

মাথার উপরে আকাশ আজও
বৈদুর্যমণির মতো জ্বলজ্বল করছে । অথচ
তারই তলায়
বিকেলবেলার শহর এখন শুয়ে আছে
বেহুঁশ জ্বোরো রুগির মতো ।
কাঠফাটা রোদ্দুরে তার সারা গায়ের
চামড়া ফেটে
বেরিয়ে পড়েছে আলকাতরা-মাখানো
দগদগে ঘা-পাঁচড়া । আর
জুতোর তলায় সেই আলকাতরার ছোপ লাগিয়ে
কেরানিবাবুরা বাড়ি ফিরছেন ।

কোথাও কিছু ঘটে না । কিছু
ঘটবে এমন
প্রত্যাশাও জাগায় না এই
ভিড়ের চাপে দম আটকে যাওয়া
দুঃখী নগরের
নোংরা ঘামে চুবিয়ে তোলা দৃশ্যাবলী । শুধু
ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে পড়া
অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার তার

শার্টের ঘাড়ের তলায় হাত চালিয়ে
ঘামাচি মারে। আর
রিকশাওয়ালা তার তেল-চিটচিটে
গামছাখানাকে বারবার মুখের সামনে ঘোরায়।

ঠিক এই সময়েই
বড়বাজারের খ্যাপা ষাঁড়ের মতো
শিং বাঁকিয়ে
ঝকঝকে নীল আকাশের গায়ে
লাফিয়ে পড়ে সেই কৃষ্ণবর্ণ
মেঘপুঞ্জ,
সারা দুপুর চুপচাপ যে কিনা
দশতলা ওই বাড়িটার পিছনে লুকিয়ে ছিল।
আকাশের মুখও তৎক্ষণাৎ
অপমানে কালো হয়ে যায়, আর তার
চোখের মধ্যে
রাগের আগুন ঝিলিক দিয়ে ওঠে।
দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমি বাজতে থাকে
মহেশ্বরের ডমরু।
বুঝতে অসুবিধে হয় না যে,
স্বর্গ আর মর্তকে যা লণ্ডভণ্ড করে ছাড়বে,
শেষ-বসন্তের সেই যুদ্ধ এবারে আসন্ন।

ভয়ে হিম হয়ে যায় বাতাস।
এতক্ষণ সে
দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চুপচাপ সব দেখে যাচ্ছিল। এখন
গোটা শহরকে প্রকাণ্ড একটা ঝাঁকুনি লাগিয়ে
চায়ের দোকানের সাইনবোর্ড উড়িয়ে,
দূরদর্শনের অ্যান্টেনা নাড়িয়ে,
রাস্তাঘাটের আবর্জনার ডাঁই তাড়িয়ে সে
দিগ্বিদিকে ছুটতে থাকে।
ধুলোর জালে ঢাকা পড়ে যায় শহর।
নোংরা মলিন সেই দৃশ্যাবলীও এখন আর কারও
চোখে পড়ে না।
এক নিমেষে সমস্ত কিছু আড়াল হয়ে যায়।

তার খানিক বাদেই নামে বৃষ্টি ।
দীর্ঘদিন ধরে যেখানে ঝাঁটপাট পড়েনি,
মুষলধারে জল ঢেলে-ঢেলে
সেই শহরকে এখন আকাশ আবার ধুয়েমুছে
পরিষ্কার করে তুলবে ।

পদ্মাপার থেকে গঙ্গাতীরে

পদ্মার পারে আমার শৈশব কেটেছে, আর
গঙ্গার তীরে আমার যৌবন।
নদীর হামলায় স্টিমারের ঘাট কীভাবে ক্রমাগত
পিছু হটতে থাকে,
শৈশবের দিনগুলিতে
গোয়ালন্দঘাটের ধুধু বালির উপরে দাঁড়িয়ে
সেই দৃশ্য আমি দেখেছি।
আর তারপর
কলকাতার এই গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে আমি দেখলুম,
বছরের পর বছর জঞ্জালের ভার টানতে টানতে
মস্ত একটা নদী কীভাবে
মস্ত একটা নর্দমা হয়ে যায়।

আমার শৈশবকে আমি অর্ধ-শতাব্দীর
ও-পারে রেখে এসেছি।
কিন্তু আজও আমি ভুলে যাইনি
পুব-বাংলার পদ্মাপারের সেই চাষি-গেরস্ত মানুষগুলির
ভয়ার্ত মুখ,
হিতাহিতজ্ঞানশূন্য উন্মাদিনী এক
নদীর তাড়া খেয়ে
ক্রমাগত যারা জমি-জিরেত ছেড়ে পালিয়ে ফিরত।
ভুলে যাইনি,
মানুষের ঘরবাড়ি, খেত-খামার, মঠ-মন্দির ইত্যাদি
যাবতীয় নির্মাণকে
উত্তাল তরঙ্গের হাত বাড়িয়ে
কীভাবে নিমেষে নিজের মুখের মধ্যে টেনে নিত
ভরা-বর্ষার কীর্তিনাশা।
নদীকে তখন নদী বলে মনে হত না।
মনে হত
ঠাকুমার-মুখে-শোনা পরন-কথার এক রাক্ষুসি রানিই যেন
জগৎ-সংসারকে গিলে ফেলে তার
খিদে মেটাচ্ছে।

জোব চার্নকের শহরে এসে সেই আমিই আবার
নদীর আর-এক রূপ দেখলুম।
সকালবেলায় জগন্নাথঘাট আর বাবুঘাটে এসে
স্নান সেরে
ঘড়ায় গঙ্গাজল নিয়ে
ঘরে ফিরে যায় হাজার-হাজার পুণ্যার্থী, আর
বিকেলবেলায়
উট্রামঘাটে ফিটন থেকে নেমে
ছড়ি ঘুরিয়ে বাবুরা সবাই হাওয়া খায়।
কোথায় সেই রাক্ষুসে চেহারা,
নদী এখানে
উদয়াস্ত এক দৈব করুণাধারার মতো বইছে।
পড়ন্ত যৌবনবেলার মতোই সে শান্ত, আর
দূরগামী জাহাজের বিদায়বাণীর মতোই সে গম্ভীর।

নদী এখানে খেপে ওঠে না, পাগলের মতো
মাথা কোটে না।
নদী এখানে স্থির, শান্ত, বরাভয়দায়িনী।
পন্টুন-ব্রিজ যখন খুলে যায়,
তখন মনে হয়,
নদীই যেন তার বুকের পাঁজর সরিয়ে নিয়ে
স্টিমার, নৌকো আর লঞ্চের জন্যে
পথ করে দিচ্ছে।
তারপর সেই হাড়-পাঁজর ফের জোড়া লাগতেই তার
বুকের উপর দিয়ে ছুটতে থাকে
হাজার-হাজার গাড়ি আর মানুষ।
বাগবাজারের ঘাটে এসে লাগে খড়বোঝাই নৌকো, আর
খিদিরপুরের গঙ্গায়
সমুদ্রগামী জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়ে
দূরদেশের যাত্রী।

সারাটা দিন যার ভরাট শরীরে
হিরের কুচির মতো ঝিকমিক করেছে
সূর্যকিরণ,
রাত্তিরে তার ঢেউয়ের উপরে

জাহাজ আর নৌকোর আলো ছল্‌কে যায়।
তারপর,
স্ট্র্যাণ্ড রোডের কিছু চোর ও ভিকিরি,
শ্মশানের কয়েকটি ডোম, এবং
নিষিদ্ধ পল্লীর কিছু নাগরিক ছাড়া
গোটা কলকাতা যখন ঘুমিয়ে পড়েছে,
অন্ধকারের মধ্যে
নিচু গলায় নিজেরই সঙ্গে কথা বলতে-বলতে
ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে সে তখন
উপরে উঠে আসতে থাকে।
নদী তখন আর নদী নয়, এক রহস্যময়ী
নিঃসঙ্গ রমণী।

কী কথা বলতে চায় এই নদী, আমরা জানি না।
জানবার জন্যে
কোনো চেষ্টাও কখনও আমরা করিনি।
সভ্যতার যে ধাত্রী,
বছরের পর বছর আমরা, ভালবাসা নয়, এই
নির্বোধ ও নির্বিকার
সভ্যতারই নিষ্ঠীবন তাকে উপহার দিয়েছি।
বছরের পর বছর
আমাদেরই জঞ্জালের ভার টানতে তাকে বাধ্য করেছি। আর
বছরের পর বছর
নোনাজলের কান্নায় ভরে উঠেছে তার বুক।

পদ্মাপারের মানুষ আমি,
গঙ্গাতীরে এসে আমি দেখে গেলুম যে,
অপমানে কীভাবে শুকিয়ে যায় এক বিশাল জলধারা। আর
মাত্রই অর্ধ-শতকের মধ্যে
ইতিহাসের মস্ত একটা নদী কীভাবে
মস্ত একটা নর্দমা হয়ে যায়।

খোলা জানালায়

খোলা জানালার পাল্লা নেড়ে দিয়ে ছুটে চলে যায়
চৈত্ররজনীর ঝোড়ো হাওয়া ।
ও কেন এমন করে জানালার ধারে
ছুটে এসেছিল ?
কিছু কি বলার কথা ছিল ওর ?
জেগেছি অনেক রাত্রি চৈত্রমাসে, খোলা জানালায় ।
তবু আজও বুঝতে পারিনি,
কেন ওর আসা, কেন ফিরে চলে যাওয়া ।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে

তা হলে এখন খুলেই বলা যাক যে,
একষট্টি বছর ধরে
একটার পর একটা পাথুরে ফলক পেরোতে-পেরোতে
হা-ক্লান্ত যে পথ ধরে আমি হাঁটছি,
তার সামনে আজও গনগনে রোদ্দুর জ্বলছে বটে, কিন্তু
পিছনে পড়েছে ছায়া।
হাঁটতে-হাঁটতে যখনই আমি
পিছন ফিরে সেই
ছাইবর্ণ পথের দিকে তাকাই,
তখনই আমি বুঝতে পারি যে,
আমারই মৃত পরিজন ও বন্ধুরা তার
দখল নিয়ে নিয়েছে।

তা হলে এখন খুলেই বলা যাক—
আপনাদের পরামর্শটা আমি
একবারও ভুলে যাইনি। আর তা ছাড়া
গায়ের উপর হামলে পড়ে
পই-পই করে
ও-সব কথা আমাকে বলবার যে খুব দরকার ছিল,
তাও তো নয়। কেননা,
পঞ্চাশ পেরুবার পরে যে আর ভুলেও কক্ষনো
পিছনে তাকাতে নেই,
তাকালে যে শুধু কষ্ট আর কষ্ট আর
কষ্টই পেতে হয়,
নিজেও তা আমি ভালই জানতুম।

কিন্তু আপনারা যা জানতেন না, তা এই যে,
পঞ্চাশই হচ্ছে সেই সীমান্ত,
যা ডিঙিয়ে আসবার পরেই মানুষ
হঠাৎ কেমন পালটে যায়।
তা হলে এখন খুলেই বলা যাক—
এগারো বছর আগেই আমি
পালটে গেছি। আর সেই তখন থেকে

সামনের দিকে হাঁটতে-হাঁটতেই আমি হঠাৎ-হঠাৎ
পিছনে ফিরে তাকাই।
আর তখনই আমি দেখতে পাই যে, আমার সামনে যদিও
গনগনে রোদ্দুর, আমার পিছনে পড়েছে ছায়া।
আমি বুঝতে পারি যে,
যেমন আমার সামনের এই রোদ্দুর, ঠিক তেমনি
পিছনের ওই ছায়াও আমাকে টানছে।

আজকাল আবার এই একটা ব্যাপার হয়েছে।
পথ চলতে-চলতে,
কী জানি কেন, মাঝে-মাঝেই আমার মনে হয় যে,
পিছন থেকে কেউ যেন আমার
সামনে এসে দাঁড়াতে চায়।
মনে হয়,
কেউ যেন আমার কাঁধের উপরে হাত রেখেছে।
আমার বাবা ? আমার মা ?
নাকি আমার সেই বন্ধুরা, যারা
সারাটা পথ
আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে-করতে, আর আমাকে
ভালবাসতে-বাসতে
কেউ-বা তিরিশ, আর কেউ-বা চল্লিশ বছর আমার
সঙ্গে-সঙ্গে হেঁটেছিল ?

লুকিয়ে তো কোনো লাভ নেই, তাই এবারে
খুলেই বলা যাক যে, আমার
চোখের পাতা
মাঝে-মাঝেই জড়িয়ে আসে। আর
এই যে ধুলোর উপর দিয়ে আমি হেঁটে যাচ্ছি, এই
ধুলোর মধ্যেই আমার তখন ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।
আমি শুনতে পাই,
ছায়াচ্ছন্ন ওই পথের ধারের মন্দিরে বাজছে ঘণ্টা।
আমি বুঝতে পারি,
পিছনের ওই ছায়ার মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে আমার
আপনজনেরা।
বাতাসে বাজতে থাকে আমার সেই ডাকনাম,

যে-নামে আজ আর কেউ আমাকে ডাকে না। আর আমার
বুকের মধ্যেও তখন
বিদায়বেলার ঘণ্টা বেজে ওঠে।

তা হলে এখন খুলেই বলা যাক—
একগলা রোদ্দুরের মধ্যে
আজও আমি হাঁটছি বটে, কিন্তু
হাজার রকমের উল্টোপাল্টা ব্যাপারের মধ্যে
জড়িয়ে গিয়ে
অনেক দিন তো আমার চোখে ঘুম ছিল না, তাই
মাঝে-মাঝেই আমার এখন
ঘুম পেয়ে যায়...আমার ভীষণ
ঘুম পেয়ে যায়।

ওয়েটিং রুম

একবার আমি বুড়োবুড়িদের এক হোম-এ গিয়ে তাদের
লাউঞ্জে ঢুকে দেখেছিলুম,
হাতে একটা পুরনো ম্যাগাজিন নিয়ে
এক বুড়ো একা-একা তার
পাতা ওল্টাচ্ছে, আর
কানে হেডফোন লাগিয়ে এক বুড়ো একা-একা
গান শুনছে, আর
টিভির বোতাম ঘুরিয়ে এক বুড়ো একা-একা
ন্যাংটো মেয়ের ছবি দেখছে, আর
ঘরের একেবারে এক-কোণে
টেবিলের উপরে তাস বিছিয়ে
কারও দিকে একবারও না-তাকিয়ে যে পেশেন্স খেলছে,
সে আদপেই বুড়ো নয়, সে বুড়ি ।

আশ্চর্য কী, এই প্রশ্নের উত্তরে
যুধিষ্ঠির নাকি বলেছিলেন,
নিত্য-নিত্য এত প্রাণী মারা যাচ্ছে, অথচ
চোখের সামনে সে-সব দেখেও যে
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি,
এর চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার আর কিছুই নেই ।

কিন্তু যেখানে কেউ কারও কাছে কিছুমাত্র
উষ্ণতা পাবে না বলেই
কেউ কারও
গা ঘেঁষে দাঁড়াবারও কোনো
উৎসাহ পায় না,
সত্যিই কি বয়সের সেই মেরুপ্রদেশে পৌঁছেও কেউ
অনশ্বরতা ইচ্ছা করে ?

বিলিতি বুড়োবুড়িদের হোম-এর লাউঞ্জে ঢুকে
আমার কিন্তু মনে হয়েছিল যে,
কেউই এরা অনশ্বরতার প্রত্যাশী নয়, এবং
হোম-টোম সব বাজে কথা, আসলে এটা

রেল-স্টেশনের ওয়েটিং রুম,
পরস্পরের অচেনা চার নিঃসঙ্গ যাত্রী যেখানে
কেউ-বা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে, কেউ
গান শুনছে, কেউ
ছবি দেখছে, কেউ টেবিলের উপরে তাস বিছিয়ে
আপন মনে খেলছে পেশেন্স।
ট্রেন এলেই এরা যে যার ঝোলা কাঁধে নিয়ে খুব
খুশি হয়েই
যে যার কামরায় উঠে পড়বে।

ওয়েটিং রুমের এই একটা ব্যাপার তো আমরা
সবাই জানি, সেখানে
পারতপক্ষে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না।

পুরনো বন্ধুরা

পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে যখন
রাস্তাঘাটে
হঠাৎ আমার দেখা হয়ে যায়,
তখন আমার মনে হয়,
আমার ছেলেবেলাই যেন অনেক-অনেক বছর
উজানে পাড়ি দিয়ে
আবার আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমার সেই ছেলেবেলাকে দেখে
কেন যে আমি একটু
লজ্জা পেয়ে যাই,
তা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।

চোখ নামিয়ে
অস্ফুট গলায় আমি বলি,
আমি তোমাকে মনে রেখেছি,
তুমিও আমাকে ছেড়ে যেও না।

গল্পের বিষয়

আমার তিন পুরনো বন্ধু অমিতাভ, হরদয়াল আর পরমেশের সঙ্গে
আজকাল একটু
ঘনঘনই আমার দেখা হয়ে যাচ্ছে।
কখনও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে,
কখনও বালিগঞ্জের লেকে,
কখনও বা
উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কের সেই
দেহাতি চা'ওয়ালার দোকানে,
গরম জলে চায়ের বদলে যে রোজ
হোগলা আর শালপাতার সঙ্গে এক-টুকরো
আদাও ফুটিয়ে নেয়।

ভিক্টোরিয়ার বাগানে হাঁটতে-হাঁটতে আমাদের
কথা হয়।
বালিগঞ্জের লেকের ধারের ছন্নমতি
বালক-বালিকাদের কাণ্ডকারখানা দেখতে-দেখতে আমাদের
গল্প হয়।
দেশবন্ধু পার্কের ঘাসের উপরে উবু হয়ে বসে
ভাঁড়ের চা খেতে-খেতে আমাদের
গল্প হয়।
তবে, যে-সব বিষয়বস্তু নিয়ে আমাদের গল্প হয়,
তার তাৎপর্য এখনকার মানুষরা ঠিক
বুঝবে না।

আমাদের গল্প হয়
মধ্য-কলকাতার সেই গলিটাকে নিয়ে,
গ্যাসের বাতির সবুজ আলোর মধ্যে
সাঁতার কাটতে-কাটতে
রাত-বারোটায় যে হরেক রকম স্বপ্ন দেখত।
আমাদের গল্প হয়
এই শহরের অঘ্রানের সেই ঘোলাটে আকাশটাকে নিয়ে,
শীলেদের বাড়ির মেজো-তরফের বড়-ছেলের
বিয়ের রাত্তিরে

চিনে কারিগর ডাকিয়ে যাকে
মস্ত-মস্ত আলোর নেকলেস পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
আমাদের গল্প হয়
কাঞ্চন থিয়েটারের প্রম্‌টারের সেই মেয়েটিকে নিয়েও,
আমরা প্রত্যেকেই যাকে একদিন
একটি করে গোড়ের মালা উপহার দিয়েছিলুম।

শেষের এই গল্পটা চলবার সময়ে আমরা
কেউই যে কিছুমাত্র
ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলি না, বরং চারজনেই চার
উজবুকের মতো
হ্যাহ্যা করে হাসতে থাকি,
তার কারণ আর কিছুই নয়, আমরা প্রত্যেকেই খুব
বুড়িয়ে গেছি।

সূর্যাস্তের দিকে

ঠিকানা লেখায় কোনো ভুল ছিল কি ? না রে বাবা, ভুলভাল ছিল না
তবু কেউ জায়গামতো পৌঁছতে পারেনি ।
রাতের রেলগাড়ি থেকে তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে
সকলেই
যেখানে নামবার কথা ছিল না তাদের,
সেইখানে নেমেছে ।

তাতে যে তাদের কারও বড্ড-বেশি অসুবিধা হয়েছে, এমনও
ভাববার কারণ নেই ।
যেখানে যে নেমেছিল, রাত্রিশেষে
সেইখানে তাবৎ দৃশ্য, তাবৎ মানুষ তার চোখে
ভাল লেগে যায় ।
প্রান্তর, জঙ্গল, ফুল, লতা, পাতা, পাখি,
নদী ও আকাশ, বাড়ি, দেবালয়, বৃক্ষ ও পাহাড়—
সবই তার
প্রভাতবেলায় বড় সুন্দর ঠেকেছে ।

সে তার ভুলের কথা কিচ্ছুই বোঝেনি । ক্রমে-ক্রমে
সেইখানে সে থিতু হয়ে বসেছে, এবং
কিনেছে চাষের জমি, হালের বলদ । ঢেলামাটি
চৈত্রমাসে গুঁড়িয়ে প্রমত্ত কালবৈশাখী ঝড়ের
প্রতীক্ষায় ছিল সে । পুঞ্জমেঘের প্রথম জলধারা
ঝরবার পরে সে আর কিছুমাত্র আলস্য করেনি,
রাত্রিশেষে ছুটে গিয়ে দিয়েছে লাঙল
ভিজে-মাঠে ।

যে যেখানে নেমেছিল, সেইখানে রোদ্দুরে আর মেঘে
সমস্ত-কিছুকে ভরে তুলবার আবেগে
যেমন দিবস, তেমনি রজনীগুলিও তার আনন্দে কেটেছে ।
সেইখানে সে সংসার পেতেছে,
ছড়িয়েছে ভূগর্ভের অন্ধকারে অজস্র শিকড়,
আকাশে অজস্র ডালপালা ।
সেইখানে সে মাটিতে পা রেখে তবু অমর্ত্যলোকের

স্বপ্ন দেখে মাঝে-মাঝে চঞ্চল হয়েছে।

কে কোথায় নেমেছিল, তা আমি জানি না। শুধু জানি,
যেখানেই যে নেমে থাকুক,
সেইখানে সে গ্রীষ্মকালে কাটিয়েছে ইঁদারা, পুকুর,
মস্ত দিঘি।
বীজতলি থেকে তুলে এনে
রুয়েছে ধানের চারা মাঠে-মাঠে বর্ষার দুপুরে।
সেইখানে সময় গেছে ঘুরে
গনগনে যৌবন থেকে নিরুদ্বেগ, নিরুত্তেজ, শান্ত প্রৌঢ়তায়।
সেইখানে যে যার সাধ্যমতো
তুলেছে বসতবাড়ি, দোচালা চৌচালা।...
কোঠাবাড়ি? চকমিলানো অট্টালিকা? ছোটবড় দু'চারটে মন্দির?...
হ্যাঁ রে বাবা, তাও তারা তুলেছে।

সন্ধ্যায় পুকুর থেকে পাতিহাঁস ডাঙার আশ্রয়ে
উঠে আসে।
গলায় কাঠের ঘণ্টা দোলাতে-দোলাতে
মাঠ থেকে দলে-দলে ফিরে আসে গোরু ও মহিষ।
অন্ধকারে দু'তিন মাইল পথ ভেঙে
হাট থেকে ঘরে ফেরে ক্রেতা ও ব্যাপারী।
তকতকে উঠোন পার হয়ে
ঝিয়ারি-বহুড়ি গিয়ে তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দেখায়।
নিমের শাখায় জমে জোনাকির নিঃশব্দ জটলা।
পূর্বপুরুষের পথ আলোকিত রাখবার প্রয়াসে
কার্তিকের কুয়াশার মধ্যে জ্বলে আকাশপ্রদীপ।
মধ্যরাতে
প্রাঙ্গণে জ্যোৎস্না ও ছায়া পরস্পরের সঙ্গে চুপি-চুপি
জায়গা বদলা-বদলি করে নেয়।

এইসব দেখে-দেখে তারা প্রত্যেকেই
নানাবিধ উপলব্ধি দিনে-দিনে সংগ্রহ করেছে।
সবচেয়ে যা বেশি করে প্রত্যেকের মাথায় ধরেছে,
তা আর কিছুই নয়, ধারাবাহিকতা।
যেমন প্রতিটি ভোরে সূর্য ওঠে, আর

সন্ধ্যায় পশ্চিমে অস্ত যায়,
যেমন প্রত্যুষে আর গোধূলিবেলায়
সমস্ত আকাশ
শব্দহীন রঙের দাঙ্গায় মেতে ওঠে,
যেমন তাতেও ধারাবাহিকতা নিরন্তর প্রস্ফুটিত হয়,
যেমন তা নিয়ে কেউ ভুলেও কক্ষনো কারও কাছে
জিজ্ঞাসা তোলে না,
এমনকি, তা নিয়ে কেউ নিজের কাছেও যে-রকম
সকালে সন্ধ্যায়
সামান্য অস্বস্তিবোধ একদিনও করেনি,
এও সেইরকম।

আসলে সবাই ধরে রেখেছিল, এইরকমই হয়।
এইরকমই দিন
যাবে, রাত্রি যাবে, আর রাত্তির পোহালে—
যেখানে শস্যের খেত ক্রমশ অস্পষ্ট হতে-হতে
দৃষ্টির বাহিরে দূরে হারিয়ে গিয়েছে, সেইখানে—
ঈশ্বরের মুণ্ডের মতন
রক্তবর্ণ সূর্যদেব দিগন্তরেখার ঊর্ধ্বে লাফিয়ে উঠবেন।
গ্রীষ্ম গেলে বর্ষা আসবে, বর্ষা গেলে শরৎ হেমন্ত আর শীত
পালাক্রমে আসতে থাকবে, আর
সর্বশেষে বসন্ত ফোটাবে ফুল অরণ্যে-উদ্যানে।
অর্থাৎ যেমন চলছে, তেমনি চিরকাল
সমস্ত-কিছুই চলবে,—ফুল, শস্য, আলো, ছায়া, বৃষ্টি ও রোদ্দুর
কোথাও কখনও
অর্বুদ কুসুমে গাঁথা এই মাল্যখানি
খণ্ডিত হবে না।

মাল্য তো খণ্ডিত হয় না, কিন্তু সে নিজেই
খসে পড়ে মালা থেকে। আজ
তার খসে পড়বার মুহূর্ত এসে হাজির হয়েছে। জমিদার
পেয়াদা পাঠিয়ে তাকে জানিয়ে দিয়েছে,
এইসব জমিজমা তার নয়, কখনও ছিল না। ভুল করে
সে দিয়েছে অন্যের জমিতে চাষ। অন্যের জমিতে
কাটিয়েছে পুকুর, তুলেছে

ঘরবাড়ি ও মন্দির। এবারে তাকে তাই
চলে যেতে হবে।...

যাবে তো অবশ্য, কিন্তু কোন্‌খানে কে যাবে ?... না রে বাবা,
তা আমি জানি না। আমি শুধু
দেখছি যে, শীতের মাঠে মাথা নিচু করে হেঁটে যায়
একা একটি বিধ্বস্ত মানুষ।
সে চলেছে সূর্যাস্তের দিকে।
সম্ভবত ওইখানে রয়েছে তার নির্ভুল ঠিকানা।

ঘরে চন্দ্রমা

বুঝতে পারিনি আমি তার কথা
সে তবু রয়েছে দাঁড়িয়ে।
যেন-বা মূর্তিমতী সরলতা
চেনা ঘরবাড়ি ছাড়িয়ে
স্বপ্নে অন্য জগতে দিয়েছে পাড়ি,
যেখানে ভিন্ন রকমের ঘরবাড়ি,
ভিন্ন বর্ণ-গন্ধের কাড়াকাড়ি
দেয় মানবিক নানা বৃত্তি ও
নানা বিশ্বাস নাড়িয়ে,
যেখানে চল্‌তি অর্থগুলিও
অনর্থে যায় হারিয়ে।

চিত্রার্পিত ভঙ্গিটি তার,
সে আছে দাঁড়িয়ে দরজায়,
যেন ছোঁয়া লাগে চিরায়মানার
অচির জীবনচর্যায়।
এত যে বয়স, তবু এই সংসারে
যা আমাকে আজও হাড়ে-মজ্জায় মারে,
কে তাকে ডোবাল জ্যোৎস্নার পারাবারে!
শেষের পরিচ্ছেদে আরবার
শুরু হল কোন্ পর্যায়।
ঘরে চন্দ্রমা, বাহিরে আঁধার
আক্রোশে ওই গর্জায়।

একটি বিগ্রহের জন্য

আমি আমার হাত লাগিয়েছি। এবারে
তুমিও তোমার হাত লাগাও।
তা নইলে
যে-মূর্তিটা আমরা দুজনেই আমাদের
স্বপ্নের মধ্যে দেখেছি,
এই পাথুরে জমির গর্ভ থেকে তাকে
মুক্তি দেওয়া যাবে না।

স্বপ্নটা আমরা আজকাল প্রায়ই দেখি।
মাটির দশহাত তলায় রয়েছে
বলরামের বিগ্রহ।
স্বপ্নেরই মধ্যে কেউ আমাদের বলে দেয় যে,
ভূগর্ভের অন্ধকার থেকে সেই বিগ্রহকে এই
আলোর রাজ্যে তুলে আনতে হবে।

কিন্তু সে তো আমার একার চেষ্টায়
হবার নয়।
আমি আমার হাত লাগিয়েছি। এবারে
তুমিও তোমার হাত লাগাও।

ও ছোট্ট মানুষ

ও ছোট্ট মানুষ, ও আমার
ছোট্ট মানুষেরা, তোমরা আর দেরি কোরো না।
চেনা ও অচেনা বিশ্বে যে যেখানে আছ,
ঘরে কি রাস্তায়,
গাঁয়ে, গঞ্জে অথবা শহরে,
যে যেখানে খেলা করছ, অথবা করছ না,
ও ছোট্ট মানুষ, তোমরা আর দেরি কোরো না, এইবার
বড় হয়ে ওঠো।

ও ছোট্ট মানুষ, তোমরা জানো,
পৃথিবীকে বাসযোগ্য করবার খেলায়
আমরা বাঁকা-বুদ্ধি পাকা-চুলের মানুষরা হেরে গেছি।

ও ছোট্ট মানুষ, তোমরা বড় হও,
বড় হয়ে তোমরা এই খেলার ভিতরে নেমে এসো।
তোমরা এসে সব্বাইকে দেখাও
পৃথিবীর মাঠে
সবচেয়ে জরুরি এই খেলাটা কীভাবে জেতা যেত।
ও ছোট্ট মানুষ, ও আমার
ছোট্ট মানুষেরা, তোমরা বড় হয়ে উঠে
এ-খেলা এইবারে জিতে নাও।

সমুদ্রে পূর্ণিমা

পূর্ণিমার চাঁদ যখন
পাঁড়-মাতালের মতন টলতে-টলতে
মধ্য-আয়ের মানুষদের জন্যে বানানো এই কটেজের সামনের
নারকেল-গাছটার ঠিক মাথার উপরে
উঠে এসেছিল, আর
নারকেল-পাতার ঝালরের উপর দিয়ে
গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল
রুপো-গলানো জ্যোৎস্না,
তখন, ঢেউয়ের গর্জন শুনতে-শুনতে,
হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল যে,
সমুদ্র আজ রাত্তিরে নির্ঘাত আমার এই
কটেজের মধ্যে এসে ঢুকে পড়বে ।

কিন্তু আমার মাথার মধ্যে এই অস্বাভাবিক ভাবনাটা
ঢুকে যাওয়া সত্ত্বেও যে আমার
ঘুমের একটুও ব্যাঘাত হয়নি,
তার কারণ আর কিছুই নয়,
আমিও সেই রাত্তিরে খুব স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলুম না ।

অনেক কাল আগের একটা ছবি

ঘাড়ের রোঁয়া ফুলিয়ে
গোয়াল-ঘরের চালের উপরে
ঝটাপটি করতে থাকে দুই
জঙ্গি শালিখ।
পুকুরে যে তিতপুঁটি মাছটা হঠাৎ জলের উপরে
মাথা জাগিয়েছিল,
দুই ঠোঁটের চিমটেয় তাকে ঝুলিয়ে নিয়ে
বাদামি রঙের কোরা আবার
নারকেল-গাছটার মাথার উপরে ফিরে যায়।
সারা রাত হিম পড়েছে, তাই এখন এই
সকালবেলায়
সিম আর বরবটির মাচার উপরে
ঝলমল করছে
রোদ্দুরের চুমকি-বসানো ওড়না।
চাঁদ-কপালি গোরুটার মুখের সামনে
ফ্যানের গামলা বসিয়ে দিয়ে
এঁটো থালা-বাসনের ডাঁই হাতে নিয়ে
খিড়কি-পুকুরের ঘাটের দিকে যাচ্ছে
এ-বাড়ির বড়বউ।

অনেক তো দেখা হল, কিন্তু
চোখ যেন আর কোনো-কিছুতেই তৃপ্তি পায় না,
অনেক কাল আগের এই ছবিটাই
বারবার
চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

পথ চিনতে না-পেরে

চেনা ছবিগুলি ক্রমেই এখন অচেনা হয়ে যাচ্ছে, আর
তার জায়গায়
একটু-একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে
অচেনা সব ছবি ।
অচেনা মানুষ, অচেনা ঘরবাড়ি, অচেনা নদী,
অচেনা গাছ আর অচেনা ফুল ।

রোজকার মতো
আজ সকালেও ঘুম ভাঙবার পরে আমি
বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম ।
তখন যে আকাশটা আমার
চোখে পড়েছিল,
ঠিক তেমন আকাশ এর আগে আর
কোনোদিনই আমি দেখিনি ।
মেঘে-মেঘে যে-সব রঙের খেলা দেখলুম, তার
একটাও আমার চেনা নয় ।

এইসব মানুষ, নদী, ঘরবাড়ি, গাছ, ফুল,
আকাশ আর মেঘ সাধারণত
স্বপ্নের মধ্যেই দেখা যায় ।
কে জানে, আমাদের স্বপ্ন যেখানে
বাস্তব হয়ে ওঠে,
ঠিকমতো পথ চিনতে না-পেরে হয়তো
সেইদিকেই আমি আমার পা বাড়িয়ে দিয়েছি ।

এই পথ

এ কি সমতলে হাঁটা ? বাঁধানো সড়কে ? তা তো নয় ।
এই পথ
পাহাড়কে বেড় দিয়ে, ক্রমাগত বেড় দিয়ে-দিয়ে
মেঘমৌলী চূড়ায় পৌঁছেছে ।
এ-পথে গিয়েছে যারা, পাত্রমিত্রসমভিব্যাহারে
তাদের হয়নি যাওয়া কোনোদিন । তারা
যাত্রার মুহূর্তে হয়তো ছিল না নিঃসঙ্গ, কিন্তু যত দিন গেছে,
ততই সঙ্গীরা পথে পিছিয়ে পড়েছে,
চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা প্রত্যেকে এ-পথে ছিল একা ।

এ-পথে কে কবে কোন্ উপকারী বান্ধবের দেখা
পেয়েছে ? কে সাহায্যের হাত
বাড়িয়ে দিয়েছে কাকে ? বস্তুত নিজেরই
আয়ুকে জ্বালানি করে এ-পথে মশাল জ্বালতে হয়,
আঁধার রাত্রির কালো মুখোশের ভয়
তা নইলে কাটে না ।
এ-পথ তো সকলের জন্যে নয় ।
লক্ষ্য না-ছিনিয়ে যার শান্তি নেই, একমাত্র সে ছাড়া
অন্য কেউ এ-পথে হাঁটে না ।

উৎসব-রজনী

কোথাও এতটুকু ময়লা নেই,
আকাশের মেঘগুলো সব
সাদা হয়ে যাচ্ছে ।
সোনার জলে ডোবানো রোদ্দুর দেখে মনে হচ্ছে
মাঠের উপরে কেউ মেলে দিয়েছে
গরদের চাদর ।

বর্ষা তো শেষ হল । তাই
প্রকৃতি এখন
নতুন করে গুছিয়ে তুলছে তার
ঘরবাড়ি ।

আজ পূর্ণিমা । আর
আমরাও তাই বুঝে নিয়েছি যে,
চাঁদের মস্ত বাতি জ্বালিয়ে
স্বর্গলোকের ওই উঠোনে আজ
শারদীয় উৎসবের
মস্ত বড় আসর বসানো হবে ।

ছোট নজর

চোর, জুয়াচোর, আর পকেটমার যে
অন্য কোথাও নয়,
আমাদের একেবারে নিকটেই আছে,
রেলগাড়ির কামরায় লেখা এই বিজ্ঞপ্তিটা
সেই কোন্ ছেলেবেলায় পড়েছিলুম। কিন্তু
তার পর থেকেই দেখছি,
আমাদের একজনেরও
নজর এখন আর
পারতপক্ষে দূরে যেতে চায় না।
প্রত্যেকেরই চক্ষু এখন
কাছেপিঠে আটকে আছে, আর
আশেপাশে যাকেই দেখা যাচ্ছে, তাকেই মনে হচ্ছে
শত্রু।

বাসে-ট্রামে যে-লোকটা আমাদের
পাশের আসনে বসে ঢুলতে-ঢুলতে একেবারে
আমাদেরই মতো
সকাল-দশটায় আপিসপাড়ায় যায়,
কিংবা সেখানে গিয়ে যে-লোকটা আমাদের
পাশের টেবিলে বসে
একেবারে আমাদেরই মতো পাঁচটা অব্দি
কলম পেষে,
কিংবা ছুটির দিনে যে-লোকটা
কেরাসিনের লাইনে
আমাদেরই মতো বিরক্ত মুখে ঠিক
আমাদেরই পিছনে এসে দাঁড়ায়,
নজর যেহেতু ছোট হয়ে গেছে, তাই
তাদের প্রত্যেককেই এখন আমরা আমাদের
ঘোরতর শত্রু বলে
খুব সহজেই শনাক্ত করে ফেলেছি।

সত্যিই যারা শত্রু, তাদের মুখে আর তাই
ছাই দেওয়া যাচ্ছে না।

আমাদের এই ছোট নজরের
ছোট বৃত্তের
বাইরে দাঁড়িয়ে তারা মুখ টিপে সারাক্ষণ
হাসছে তো হাসছেই ।

যদ্দুর চোখ যায়

হামাগুড়ি দিয়ে
যে-বাড়িটাতে এসে ঢুকেছিলুম, এখন
মাথা উঁচু করে
তার দেউড়ি দিয়ে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।
এখন আর আমার চিত্তে কোনো
গ্লানি নেই।
কারও উপরে কোনো রাগ নেই, কিংবা
কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ।

খেলার যেটা নিয়ম,
সেটা মেনেই আমি খেলেছি। আর তাই
হারলুম না জিতলুম,
এই প্রশ্ন এখন আর আমাকে
একটুও বিব্রত করে না।

আমার মাথার উপরে
আশ্বিন মাসের নীল নির্মেঘ আকাশ।
আমার পথের ধারে নদী।
নদীর জলে পল-কাটা কাচের চুড়ির মতো ঝিকমিক করছে
সকালবেলার রোদ্দুর।
আমার পায়ে আর এখন বেড়ি নেই।
যদ্দুর চোখ যায়,
হাঁটার আনন্দেই আমি এখন হেঁটে যেতে পারব।

অন্ধকারে, একলা মানুষ

ঠাট্টা, হাসি, গান, কলরব
যেই থেমেছে, দূরে কাছে
দেখছি পথের সঙ্গীরা সব
স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যাপার কী, আর গল্প কি নেই ?
রাস্তাটা যে অনেক বাকি।
চোখ তুলে কালপুরুষ দেখেই
ফুরিয়ে গেল সব কথা কি ?

সত্যি ছিল সঙ্গীরা ? ধুস্,
মধ্যরাতে পথের ধারে
এই তো আমি একলা মানুষ
দাঁড়িয়ে আছি অন্ধকারে।

কাছে-দূরে, ভালবাসা

কে জানে কোথায় আছে ভালবাসা, দূর
পাহাড়ে না কাছের দিঘিতে।
চারিভিতে তারই নাম গায় ত্রুবাদুর
পাথরে বাঁধানো সরণিতে।

সে-গান যেমন দূর আকাশের নীলে
তেমনি সে-গান বেজে যায়
দূর থেকে কাছে আসা জীবনের মিলে
হাসিতে ও অশ্রুধারায়।

এই ছিল কাছেপিঠে, এই গেল দূরে,
নানা দিকে বেজে ওঠে সুর।
জ্যোৎস্নায় রাত্রির বুক যায় পুড়ে,
কেঁপে ওঠে মেঘলা দুপুর।

ওরা তিনজন

নিজেদেরই ঘরে ওরা সিঁদ কেটেছিল কাল রাতে
সকালবেলায়
মুখ চুন করে ওই তিনটি হাভাতে
ঘর ছেড়ে দূরে চলে যায়।

ঘরে যে কিছুই নেই, তা ওরা কেউই জানত না।
রাত্রি যখন
নেমে আসে, পূর্ণিমা-রজনীর সোনা
সারা গায়ে মাখে ঝাউবন।

বন পার হয়ে ওরা চলে গেছে কাঙালিটোলায়।

না-বললেও হত

এ-বছরের কথা
বছর ঘুরলেই বাসী হয়ে যায়।
এ-মাসের কথার
দরকার ফুরিয়ে যায় ও-মাসে।
এ-হপ্তায় যা বলতে চাই,
ও-হপ্তায় তার কোনো অর্থ থাকে না।
এখন আর আমার
বুঝতে একটুও বাকি নেই যে,
বড্ড তাড়াতাড়ি সব
বদলে যাচ্ছে।

কাল রাত্তিরের অন্ধকারে তোমাকে যা
বলেছিলুম,
এখন এই সকালবেলায় মনে হচ্ছে যে, তা
না-বললেও হত।
কেননা, এখন সূর্য উঠেছে, আর
টিনের চালে যে হিমের বিন্দুগুলিকে
ঘামের ফোঁটার মতো দেখাচ্ছে,
তার উপরে ঝিলিক দিচ্ছে
বরফের মতো ধারালো নীল রোদ্দুর।

ঝাড়া হাত-পা

সুতোয় এখন আর
নতুন করে গিঁট লাগাবার তো কথাই ওঠে না,
পুরনো গিঁটগুলিকেও
একটা-একটা করে ওরা এখন
খুলে ফেলছে ।

ওরা জানে,
এখন আর কিছু ধরে রেখে কোনো লাভ নেই ।
আর তাই
জলের দরে ওরা এখন বিক্রি করে দিচ্ছে ওদের
পালঙ্ক আর সোফা-সেটি,
আলমারি আর চেয়ার-টেবিল,
ফ্রিজ, টিভি আর ক্যামেরা,
রবীন্দ্রসংগীতের
যাবতীয় রেকর্ড আর স্টিরিও ।

ঝাড়া হাত-পা হয়ে,
এখানকার পাট তুলে দিয়ে ওদের এখন
অন্য জায়গায়
চলে যাবার পালা ।

কবির স্মৃতি

ওর মনের মধ্যে একটা
ফিল্টার বসানো আছে তো, তাই
যতই না কেন ময়লা-ধুলো তার মধ্যে তোমরা
ঢুকিয়ে দাও,
চুঁইয়ে-চুঁইয়ে যে জলটুকু ওর
মনের তলায় গিয়ে জমছে,
তেমন টলটলে জল আর
কোথাও তোমরা পাবে না।

কবে কোথায় কোন্ কানাগলির মধ্যে
তোমরা ওকে
টেনে নিয়েছিলে, আর ওর
পিঠের উপরে বসিয়ে দিয়েছিলে ছুরি,
নিশ্চিন্ত থাকতে পারো,
এখন আর তা ওর মনে নেই।